বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৮-৯৪)

পরিচয়।। বাংলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার অন্যতম প্রধান প্রাবন্ধিকও। বাংলা ভাষার জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে মৌলিক প্রবন্ধ লিখবার জন্য তিনি দেশের গুণিজনকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। বাঙালির চিন্তার রাজ্য যাতে প্রসারিত হয়, জ্ঞান ও কর্মে যাতে নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি 'বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশ করেন। লঘু-গুরু যে কোন ধরনের প্রবন্ধই যে রচনাগুণে 'সাহিত্য' হয়ে উঠতে পারে বঙ্কিমই তা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেন। অনেক বাঙালি লেখক তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইতিহাস-গবেষণার গুরুভার গ্রহণ করেন, কেউ কেউ সাহিত্য-সমালোচনায় হাত দেন, অনেকে দর্শনাদি বিষয়ে প্রবন্ধ লেখায় ব্রতী হন, কেউ কেউ আবার লঘু-কৌতুকরসের নিবন্ধ রচনা করতে থাকেন।

গ্রন্থাবলী।। বঙ্কিমচন্দ্রের লঘু ও গুরু, সাহিত্যধর্মী এবং চিন্তাপ্রধান সর্ববিধ প্রবন্ধের উল্লেখ গ্রন্থের তালিকা এখানে দেওয়া হল। 'লোকরহস্য' (১৮৭৪) কৌতুকরসাত্মক নকশার সঙ্কলন। 'বিজ্ঞানরহস্য' (১৮৭৫) বিজ্ঞানবিষয়কে জনপ্রিয় করবার উদ্দেশ্যে রচিত প্রবন্ধসংগ্রহ। 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫) পরের সংস্করণে কমলাকান্তের পত্রগুলি যুক্ত হয়ে 'কমলাকান্ত' নামে প্রচারিত। 'বিবিধ সমালোচনা' (১৮৭৬), 'প্রবন্ধপুস্তক' (১৮৭৯) গ্রন্থ দুটি একসঙ্গে 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথম ভাগ নামে প্রকাশিত হয়। 'বিবিধ প্রবন্ধ' দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে।'সাম্য' (১৮৭৯) 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬) এবং 'ধর্মতত্ত্ব' বা 'অনুশীলন' (১৮৮৮) তাঁর অপরাপর বিখ্যাত প্রবন্ধ গ্রন্থ।

নানা বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ লিখেছেন। সব বিষয়েই যে তাঁর সমান জ্ঞান ছিল এবং সর্ববিধ প্রবন্ধেই যে তিনি সমান সাফল্য লাভ করেছেন এমন মনে করবার কারণ নেই। বিশেষ করে সাহিত্য-সমালোচনা, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের আলোচনা এবং ধর্ম ও দর্শনের ব্যাখ্যানে তিনি অধিক আকর্ষণ অনুভব করেছেন।

সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র।। বঙ্কিমের হাতে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য পরিণতি লাভ করে, পূর্ববর্তী সমালোচনার তুলনায় তার গুণগত সমুন্নতি ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ঈশ্বর গুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদের সম্পর্কে আলোচনায় সূক্ষ্ম অর্ন্তদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি প্রাচীন সাহিত্যের সমালোচনায় এবং সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যের তুলনামূলক বিচারে আপন রসদৃষ্টির গভীরতার নিশ্চিত প্রমাণ রেখে গিয়েছেন। আবার গীতিকাব্য সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি নাটক ও উপন্যাসের সঙ্গে গীতিকবিতার পার্থক্য সম্পর্কে যে সব সূত্র নির্দেশ করেছেন আজ পর্যন্ত তার মূল্য স্বীকার্য।

বঙ্কিমের সমালোচনার রীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রধান সূত্র আলোচনার যোগ্য। ১. সমালোচন পদ্ধতির দিক থেকে তিনি বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গির বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে সমগ্রের বোধেই সৌন্দর্য-উপলব্ধি সম্ভব। এখানে একটি উপমা, ওখানে একটি অনুপ্রাসের খোঁজ করা সমালোচকের কাজ নয়। এই সাঙ্ঘটিক পদ্ধতি বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের এক প্রধান উত্তরাধিকার। ২. সাহিত্যের স্বরূপ-নির্ণয় প্রসঙ্গে বঙ্কিমের মত এই যে স্বভাবানুকারিতা এবং সৌন্দর্য-সৃষ্টির যোগই সাহিত্যের প্রাণ। প্রথমটির অভাবে সাহিত্য অলীক বস্তু হয়ে ওঠে, দ্বিতীয়টির অভাবে তা প্রাণহীন ও রসহীন হয়ে পড়ে। ৩. সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও বঙ্কিমের অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সাময়িক বাংলা সমালোচনায় এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে তুমুল বিতর্ক উঠেছিল। একদল সমালোচক সামাজিক নীতি ও সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষাই সাহিত্যের একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করতেন, অন্যদল সৌন্দর্য-সৃষ্টিকে সাহিত্যের উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করলেন। সৌন্দর্যসৃষ্টি যে সাহিত্যর মুখ্য উদ্দেশ্য এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিধাহীন ছিলেন। কিন্তু নীতিশিক্ষার প্রশ্নটি তিনি একেবারে অস্বীকার করতে পারেননি। তবে নীতিশিক্ষা দান সাহিত্যের গৌণ উদ্দেশ্য এবং তা প্রধান কর্তব্যের দ্বারাই ধীরে ও ক্রমে ক্রমে সাধিত হবে এই হল তাঁর অভিমত। পাঠকদের উপদেশ দিয়ে নীতিজ্ঞ করে তোলা উদ্দেশ্য নয়, সৌন্দর্যসৃষ্টির মধ্য দিয়ে নীতি ও ধর্মবোধের প্রতি আসক্তি জন্মানোই তার প্রকৃত লক্ষ্য। ৪. সংস্কৃত রসবাদ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরূপতার কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। রসবাদী সমালোচনার সীমাবদ্ধতা দেখিয়ে তিনি এই পদ্ধতির সাহিত্যবিচার পরিহারের পক্ষে মত দিয়েছেন। এর দ্বারাও ইংরেজি সমালোচনা পদ্ধতির প্রতি তাঁর অনুরাগ অনেকটা প্রমাণিত হবে।

চিন্তাপ্রধান প্রবন্ধ।। সাহিত্য-সমালোচনাকেও চিন্তাপ্রধান প্রবন্ধ বলেই গণ্য করা উচিত। তবে এখানে সৌন্দর্যচর্চাই লক্ষ্য, জ্ঞানচর্চা নয়। জ্ঞানচর্চামূলক চিন্তামুখ্য প্রবন্ধ রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র চিন্তাগত যে মৌলিকতা দেখিয়েছেন তার স্বরূপ আলোচনার যোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র জীবনে য়ুরোপীয় দার্শনিক কোঁতের সমর্থক ছিলেন এবং নিরীশ্বরবাদী হয়ে উঠেছিলেন। রুশো, বেন্থাম, মিলের চিন্তাধারার প্রভাবও তাঁর উপর পড়েছিল। এই সময়ে তিনি 'সাম্য', 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রভৃতি প্রবন্ধে সমাজবাদের পক্ষ সমর্থন করেন। ভারতে তিনিই সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রের সপক্ষে গ্রন্থ রচনা করেন। কার্ল মার্ক্সের First International-

এর মতবাদের সঙ্গে তার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল বলে মনে হয় না। তিনি ওয়েব-সাইমন প্রভৃতির Utopian Socialism মতবাদের দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু পরিণত বয়সে তাঁর মতবাদে পরিবর্তন দেখা দেয়। তিনি গীতার মর্মবাণীর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং প্রচার করতে থাকেন যে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি— তিনের বিকাশ ও সমন্বয়ের মধ্যেই মনুষ্যত্বের আদর্শ। 'মনে কোন বাসনা না রেখে কর্ম করে যাওয়া এবং সর্ব কর্মফল ভগবানে অর্পণ করা' হয়ে দাঁড়াল বঙ্কিমচন্দ্র প্রচারিত নূতন জীবনাদর্শ। ।

'কৃষ্ণ চরিত্র একাধারে ধর্মতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব।.... বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রে প্রথমতঃ মহাভারতের ঐতিহাসিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন— তিনি নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন, মহাভারত কল্পনামূলক কাব্য নয়, অনেকাংশে প্রামাণিক ইতিহাস (History)।' দার্শনিকপ্রবর হীরেন্দ্রনাথ দত্তের এই অভিমত তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণ চরিত্র গ্রন্থে যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন সে বিষয়ে মতভেদ থাকলেও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, তিনি 'বীরদর্প' সহকারে কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে স্বাধীন মনুষ্যবুদ্ধির জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রকে ঐতিহাসিক যুক্তি দ্বারা তন্নতন্ন রূপে পরীক্ষা করিয়াছেন এবং চিরপ্রচলিত বিশ্বাসগুলিকেও বিচারের অধীনে আনয়নপূর্বক অপমানিত বুদ্ধিবৃত্তিকে পুনশ্চ তাহার গৌরবের সিংহাসনে রাজাসন দিয়াছেন। (রবীন্দ্রনাথ)।

ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক বিষয়ে প্রবন্ধ রচনায়ও বঙ্কিম বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর এ বিষয়ের আলোচনায় প্রধানত যেসব সমস্যার বিচার করা হয়েছে তা হল — ১. ভারত তথা বাংলাদেশের বীর্যহীনতা বিষয়ে যেসব কলঙ্কের অভিযোগ করা হয় তার সত্যতা নির্ধারণ। ২. ক্রমবিকাশের সূত্র নির্ণয় এবং ব্যাখ্যানই যে ইতিহাসবোধকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে পারে— এই ধারণা এদেশে তিনিই প্রথম প্রচার করেন। ৩. বাঙালির উৎপত্তি বিষয়ক আলোচনা। এই সব বিষয়ের আলোচনায় তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করলেন য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণ সেই প্রণালীতে সবে সে দেশের ইতিহাস রচনার চেষ্টা করছিলেন, এ দেশের ইতিহাস বিচারে সে প্রণালীতে তখন কেউ চিন্তা পর্যন্ত করেননি। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে, 'এই যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী হইতে কতগুলি ঐতিহাসিক সত্য নিঃসৃত হইয়াছিল, বিগত অর্ধশতাব্দীর শত শত নূতন আবিষ্কারেও তাহাদিগের সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এই ঐতিহাসিক সত্যগুলি মহাজন উক্তির মতন বলিয়া যান নাই; এখন আমরা যেমন করিয়া ঐতিহাসিক সত্য প্রমাণ করিবার চেষ্টা করি, বহু সত্যাসত্যের মধ্য হইতে যেমন করিয়া ঐতিহাসিক সার সত্যটুকু বাছিয়া লইতে যত্ন করি, তিনিও তেমনি করিয়া সেইরূপ প্রণালী অবলম্বনেই তাঁহার উক্তিগুলির সত্যতা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন।' কোনো জাতির ইতিহাস যে রাজন্যবর্গের তালিকামাত্র নয়, নৃতাত্ত্বিক অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ, বাঙ্কম তা শেখালেন।

সাহিত্য ধর্মী প্রবন্ধ।। 'লোক রহস্যে'র প্রবন্ধগুলি 'সমাজব্যঙ্গমূলক। এগুলিতে বিষয়বস্তু অপ্রধান না হলেও রচনা-রসসম্ভোগও সমান গুরুত্বপূর্ণ। চিন্তাকে এখানে ব্যঙ্গ ও কৌতুকরসে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এগুলির ব্যঙ্গরস মাঝে মাঝে বেশ তীব্র হয়ে উঠেছে; অসঙ্গত কল্পনা; উদ্ভট পরিস্থিতি, রঙ্গাত্মক অতিরঞ্জন এই সব রচনায় হাস্যরসের কারণ হয়ে উঠেছে। শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে যে ব্যঙ্গাত্মক নকশার প্রচলন হয়েছিল বঙ্কিমের এ রচনায় তা

উৎকর্ষের চরমে উঠেছে।

বঙ্কিমের কমলাকান্ত একটি অতি উচ্চস্তরের প্রবন্ধ গ্রন্থ। এর মধ্যে যারা ডিকুইন্সির 'Confessions of An Opium Eater'-এর সাদৃশ্য খোঁজেন তাঁরা বহিরঙ্গকেই অধিক গুরুত্ব দেন। রচনাটির মৌলিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না। কমলাকান্ত নামক আফিমখোর, অপ্রিয় সত্যভাষী, অন্তরের গভীরে নির্জন একাকিত্ব বহনকারী ব্যক্তিটির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তি-আত্মার পুরো প্রতিফলন ঘটেছে এরূপ মনে করা সঙ্গত নয়। এই দপ্তরে নানা ধরনের প্রবন্ধ আছে। কয়েকটি প্রবন্ধে গীতিরস চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে। কমলাকান্তের মাধ্যমে বঙ্কিমের নির্জন ব্যক্তিসত্তার আর্তি ধ্বনিত হয়েছে। গদ্য ভাষাকে কতটা নমনীয় করে গীতিঝঙ্কারের সৃষ্টি করা যায় বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের দপ্তরে তা দেখিয়েছেন। এই গ্রন্থের অপর কতকগুলি রচনা রূপকধর্মী এবং ব্যঙ্গাত্মক। এখানে বঙ্কিমের বিদ্রূপাত্মক ভাষার শাণিত তীরে এবং উদ্ভট কল্পনার রূপবিলাসে সামাজিক বিচিত্র অসঙ্গতি এবং জাতীয় চরিত্রের নানা দুর্বলতা তীব্র আঘাত পেয়েছে।